প্রায় আড়াইশো বছর আগে, ১৭৭৫-এ এই বাংলায় মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি ঘিরে বিতর্কে তোলপাড় হয়েছিল বিলেতের পার্লামেন্টেও। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তদানীন্তন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এবং অন্যায় বিচারে পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ এনেছিলেন পার্লামেন্ট সদস্য স্বনামধন্য এডমন্ড বার্ক। মৃত্যুদণ্ড নিয়ে বিতর্ক চলেছে সারা বিশ্বেই। সাম্প্রতিক অতীতে এ দেশে মকবুল ভাট থেকে আফজল গুরু, ইয়াকুব মেমন...প্রতিটি মৃত্যুদণ্ডেই বেড়েছে সংশয়-বিতর্ক।

২০০৪-এ ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসিও তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। মৃতুদণ্ডের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল গোটা দেশেই। প্রভাবশালীদের চাপে এক নির্দোষকে হত্যা করা হচ্ছে—শোনা গিয়েছিল এমন সন্দেহের কথাও। দশক পেরিয়ে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের রাশিবিজ্ঞান বিভাগের দুই অধ্যাপক—দেবাশিস সেনগুপ্ত এবং প্রবাল চৌধুরীর গবেষণা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, গরিব ধনঞ্জয়কে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল অন্য কারও অপরাধে। তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার ত্রুটিতে এমন ঘটনার বিশদ তথ্য সাধারণ মানুষের জানা দরকার তাঁদের নিজেদের স্বার্থেও।

বিচার-বিভ্রাটে এক বার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেলে মানুষটাকে আর ফেরানোর সুযোগ থাকে না। এ হেন অপরিবর্তনীয় সাজা থাকা উচিত কি না—সঙ্গত ভাবেই সে প্রশ্ন রয়েছে। মরণোত্তর বেকসুর ঘোষণা, সম্মান ফেরানোর দাবিও জোরালো হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বেশ কয়েকটি দেশে সে ব্যবস্থা তৈরিও হয়েছে ইতিমধ্যে। এ দেশেই বা হবে না কেন? সমগ্র ইউরোপ-সহ ১৪০টি দেশ মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করেছে, ভারত কেন হাঁটবে না সে পথে? আশার কথা, ত্রিপুরা বিধানসভা সম্প্রতি মৃতুদণ্ড বিলোপে সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ কি ভাবতে পারে না?

প্রচ্ছদশিল্পী: কৃষ্ণেন্দু চাকী

প্রকাশনা উদ্যোগে: ক্যাম্প। মন্থন সাময়িকী। যাপন। আংরাভাসা। মুক্তমন

ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসি

নিরপরাধের মৃত্যুদণ্ড

দেবাশিস সেনগুপ্ত
প্রবাল চৌধুরী

ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসি
নিরপরাধের মৃত্যুদণ্ড

দেবাশিস সেনগুপ্ত ও প্রবাল চৌধুরী

ক্যাম্প

Hanging of Dhananjoy Chattopadhyay : Execution of an innocent
(in Bengali) by Debasis Sengupta and Probal Chaudhuri

প্রকাশকাল	অক্টোবর ২০১৫
প্রকাশক	ক্যাম্প, ২বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
প্রকাশন সহায়তা	যাপন মন্থন সাময়িকী আংরাভাসা মুক্তমন
মুদ্রণে	প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯
মূল্য	পাঁচ টাকা

একটি পুনর্বিশ্লেষণ

ভবানীপুরের পদ্মপুকুর রোডে অষ্টাদশী স্কুলছাত্রী হেতাল পারেখকে খুন (৫ মার্চ ১৯৯০) করার অপরাধে নিরাপত্তারক্ষী ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসি হয় ২০০৪ সালের ১৪ আগস্ট। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নিম্ন আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল; হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে সেই দণ্ডই বহাল থাকে। ধনঞ্জয় বরাবর বলে এসেছেন, তিনি নির্দোষ। ফাঁসির সময় তিনি শান্ত ছিলেন। এক পুলিশ অফিসারকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, ভবিষ্যতে পুলিশি তদন্ত যেন একটু যত্নের সঙ্গে করা হয়। এর পর উপস্থিত সবাইকে ভাল থাকতে বলে তিনি বিদায় নেন।

আদালতের নথিপত্র খুঁটিয়ে দেখে, ১৯৯০ সালে খবরের কাগজে এই বিষয়ে পুলিশের বিবৃতি–সহ যা যা খবর বেরিয়েছিল — সেগুলি খুঁটিয়ে পড়ে, ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে আর প্রতিবেশী, পরিচিতজন, পুলিশ, সাক্ষী, আইনজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের সঙ্গে কথা বলে আমরা এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছি।

পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে গেলে যে সুনির্দিষ্ট শর্তগুলি পূরণ হওয়া অবশ্য প্রয়োজন, ধনঞ্জয়ের মামলায় প্রতিটি আদালতের রায়েই তার উল্লেখ আছে। যেমন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, **"এক একটি পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ যেন আর কারও নয়, শুধু অভিযুক্তেরই দোষের ইঙ্গিত দেয়। সাক্ষ্যপ্রমাণগুলির সূত্র এমন সম্পূর্ণ হতে হবে যাতে অভিযুক্তকে নির্দোষ মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ অবশিষ্ট না থাকে।"** আমাদের অনুসন্ধান থেকে শুধু নতুন তথ্য নয়, সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের একটি বিকল্প ব্যাখ্যা উঠে এসেছে, যা প্রতিটি আদালতের নজর এড়িয়ে গেছে। আমরা যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছি, ধনঞ্জয় সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন। এই সম্ভাবনা এত প্রবল যে তদন্ত নতুন করে শুরু করার এবং সেই অনুসারে মামলার পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে। মরণোত্তর 'বেকসুর' ঘোষণার মাধ্যমে কলঙ্কমোচনের প্রয়োজনও সেই কারণেই।

ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণে গোলমাল

ধনঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তিন প্রধান সাক্ষীর বক্তব্য ও তিনটি প্রামাণ্য বস্তুর ভিত্তিতে। দাবি করা হয়েছিল যে, বিকেল পাঁচটা কুড়ি নাগাদ হেতালের মা মন্দিরে গিয়েছিলেন, পাঁচটা পঞ্চাশে ফিরে এসেছিলেন। ওইটুকু সময়ে নাকি ধর্ষণ হয়েছে, মেয়েটির শরীরে বাইশটি আঘাত করা হয়েছে এবং তাঁকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। তা ছাড়া একটি হাতঘড়িও চুরি করা হয়েছে। ধনঞ্জয় যে বেসরকারি সংস্থার সিকিউরিটি গার্ড ছিলেন, তারই আর এক সিকিউরিটি গার্ড এবং এক সুপারভাইজার দাবি করেন যে, তাঁরা ধনঞ্জয়কে ওই সময় বিল্ডিংয়ে ঢুকতে দেখেছিলেন এবং তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি হেতালদের চারতলার ফ্ল্যাটের ঝুলবারান্দা থেকে ঝুঁকে কথাবার্তাও বলেছিলেন ওই আধ ঘণ্টার মধ্যে। আদালতের নজরে আসেনি যে, সেই ঝুলবারান্দা বিল্ডিং তৈরির সময় থেকেই গ্রিল দিয়ে মোড়া ছিল; সেখান থেকে ঝুঁকে সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। আর সাক্ষীরা যেখান থেকে তাঁকে দেখার কথা বলেছেন, সেখান থেকে চারতলার বারান্দা দেখাই যায় না (বাড়ির নকশা দেখুন)।

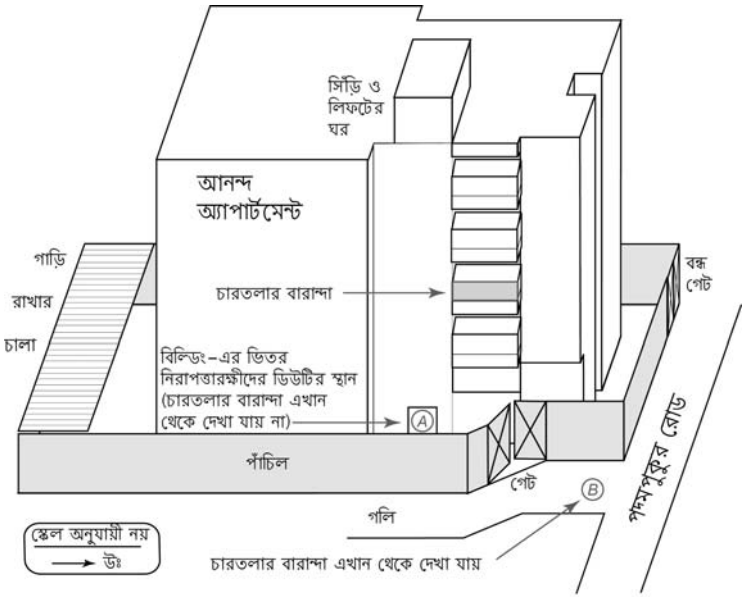

আনন্দ অ্যাপার্টমেন্টের ত্রিমাত্রিক নকশা

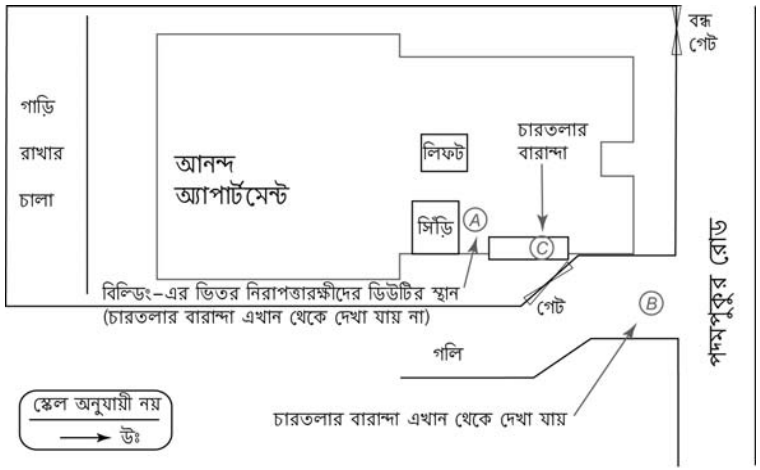

আনন্দ অ্যাপার্টমেন্টের একতলার প্ল্যান

তৃতীয় প্রধান সাক্ষী ছিলেন বিল্ডিংয়ের লিফটম্যান; কিছুক্ষণ সাক্ষ্য দেওয়ার পর তাঁকে 'বিরূপ সাক্ষী' বলে ঘোষণা করা হয় আদালতে। সরকারপক্ষের বক্তব্য — তিনি লিফটে করে ধনঞ্জয়কে হেতালদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আদালতে লিফটম্যান এ কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেন। যে সময় এই রক্তারক্তি খুন হয়েছে বলে সরকারপক্ষের দাবি, লিফটম্যান শুধু জানান, তার ঠিক পরে তিনি ধনঞ্জয়কে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছেন। ঘটনার দিন রাত্রে পুলিশের তরফে সাংবাদিকদের যা জানানো হয়েছিল, সেই রিপোর্টে লিফটম্যানের এই বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে; সেই সঙ্গে আরও জানা যায় যে ধনঞ্জয়ের সাদা জামাকাপড়ে কোনও রক্তের দাগ ছিল না। (আদালতে কোনও সাক্ষীই ধনঞ্জয়ের জামাকাপড়ে কোনও দাগ দেখেছেন বলে জানাননি।) ঝুলবারান্দা থেকে কথাবার্তার প্রসঙ্গও সেই সব রিপোর্টে ছিল না। ঝুলবারান্দার যে দরজা দিয়ে নীচের সিকিউরিটি গার্ডের ডাক ধনঞ্জয়ের কানে পৌঁছেছিল বলে দাবি করা হয়েছে, সেখান দিয়ে নারীকণ্ঠের আর্ত চিৎকারও কেউ শুনতে পেয়েছিলেন বলে খবর নেই।

অপরাধের স্থান থেকে যে তিনটি প্রামাণ্য বস্তু পাওয়া গিয়েছিল বলে দাবি, তার মধ্যে ছিল গলায় পরার একটি ধাতব চেন, বিপরীত দিকের ফ্ল্যাটের এক পরিচারক সেটিকে তাঁর নিজের বলে দাবি করেছিলেন। আদালতে গিয়ে তাঁর গল্প পালটে যায়; তিনি বলেন, চেনটি ধনঞ্জয়কে উপহার দিয়েছিলেন। আর একটি বস্তু ছিল ধনঞ্জয়ের কাছ থেকে 'উদ্ধার' হওয়া একটি ঘড়ি, যা নাকি খুনের দিন 'চুরি' গিয়েছিল। অথচ ঘটনার সময় পুলিশের তরফে মিডিয়াকে বলা হয়েছিল যে, কোনও জিনিসই চুরি যায়নি। এই ঘড়িটির সিরিয়াল নম্বর আবার কাগজপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাও হয়নি। পুলিশের সঙ্গে ঘড়ির দোকানের যোগাযোগ ছিল, সেখানকার রেকর্ড থেকে সে কাজ সহজেই করা যেত। তিন নম্বর প্রামাণ্য বস্তু হল অপরাধের স্থান থেকে পাওয়া একটি বোতাম। ফরেনসিক পরীক্ষায় এই বোতামটির যোগ পাওয়া যায় ধনঞ্জয়ের বাড়ি থেকে গোলমেলে ভাবে 'উদ্ধার' হওয়া একটি জামার। এই সব তথাকথিত উদ্ধারের কোনও নিরপেক্ষ সাক্ষী ছিল না। যে দু'জন সাক্ষীর সই সিজার লিস্টে ছিল, তাঁদের এক জনকে আদালতে হাজির করা যায়নি, আর অন্য জন

থানার উল্টো দিকে মিষ্টির দোকানে কাজ করতেন এবং থানায় চা সরবরাহ করতেন বলে জানা যায়। আমাদের ক্যামেরার সামনে তিনি স্পষ্ট জানান — ধনঞ্জয়ের বাড়ি থেকে কোনও জিনিস উদ্ধার হতে তিনি দেখেননি, বরং পুলিশের চাপে আদালতে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন। খুনের জায়গা থেকে 'উদ্ধার' হওয়া জিনিসগুলি নিয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। দরজা ভেঙে হেতালের মৃতদেহ আবিষ্কার হওয়ার পরে পুলিশকে খবর দিতে তিন ঘণ্টারও বেশি দেরি হয়। পুলিশ হাজির হওয়ার আগে মৃতদেহ বার বার সরানো হয়েছিল আর ঘটনাস্থলের উপর দিয়ে বহু লোক যাওয়া-আসা করেছিল।

খুনের উদ্দেশ্য নাকি ছিল প্রতিশোধমূলক। দাবি করা হয়েছিল, ধনঞ্জয় হেতালকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে উত্ত্যক্ত করতেন এবং সে কথা হেতাল বাবা-মাকে জানালে তাঁরা সিকিউরিটি এজেন্সির কাছে অভিযোগ করে তাঁর বদলির ব্যবস্থা করেন, আর তাতেই ধনঞ্জয় চটে যান। দাবির সমর্থনে আদালতে পেশ করা হয় এজেন্সির সই করে গ্রহণ করা একটি অভিযোগপত্র ও তার ভিত্তিতে বদলির লিখিত নির্দেশ। এজেন্সির এক কর্মী সাক্ষ্য দেন, সেই নির্দেশ নাকি ধনঞ্জয়ের হাতে ধরানোও হয়েছিল। খুনের চার মাস পরে আবিষ্কার হওয়া এই 'লিখিত অভিযোগ' ও 'বদলির নির্দেশ' বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই সব এজেন্সি তাদের কর্মীদের পারিশ্রমিক পর্যন্ত দেয় ঘণ্টা মেপে, ভাউচারে; বদলির জন্য লিখিত নির্দেশের চলই নেই। ধনঞ্জয়ের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর খুনের পর দিন সব কাগজে বেরোলেও এই 'বদলি'র খবর বা 'উত্ত্যক্ত' করার কোনও খবর বেরোয়নি। 'উত্ত্যক্ত' করার খবর কাগজে বেরিয়েছিল তার পরের দিন, এবং তাতে বলা হয়েছিল, অভিযোগ হেতাল নিজে করেননি, করেছেন তাঁর দাদা। ধনঞ্জয়-সহ বিল্ডিংয়ের সব গার্ডকে 'বদলি' করার কথাবার্তা চলছিল বলে খবর বেরিয়েছিল তারও পরের দিন, আর সেই বিবরণের সঙ্গে সরকারপক্ষের আদালতে জানানো কাহিনী (একা ধনঞ্জয়ের খুনের দিন থেকে বদলি হওয়া) মেলে না। এই ভাবে ধাপে ধাপে খবর বেরোনো, সবচেয়ে জরুরি খবর সবচেয়ে দেরিতে বেরোনো, বদলির কাহিনীর গরমিল — এই সব থেকে মনে হয় গোটা অভিযোগটাই সাজানো। তা ছাড়া হেতাল যদি ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগই করে থাকবেন, তা হলে

ফ্ল্যাটে একা থাকা অবস্থায় দরজা খুলে তাঁকে ঢুকতে দিতে যাবেন কেন, বিশেষ করে যখন দরজা না খুলে ফিশআই লেন্স দিয়ে বাইরেটা দেখা যেত?

বিকল্প সম্ভাবনা

এই মামলায় পুলিশের তদন্ত এগিয়েছিল প্রধানত হেতালের মা-বাবা-দাদার বিবরণের ভিত্তিতে। এটা মনে রাখতে হবে যে, বাইরের কারও পক্ষে নিরাপত্তারক্ষীর নজর এড়িয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির চারতলায় গিয়ে খুন করে আসা প্রায় অসম্ভব। রাগের মাথায় — প্রস্তুতি ছাড়া, অস্ত্র ছাড়া — একের পর এক এলোপাথাড়ি আঘাতে খুন করার মতো সময় তার থাকবে না। আর দীর্ঘক্ষণ ঝটাপটির পর স্নান করা বা জামা পাল্টানোর সুযোগও তার নেই। সুতরাং হেতালের বাড়ির লোকের উপর সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। আবার তাঁদের কথা অনুযায়ী, দুপুরের পর থেকে বাড়িতে হেতালের সঙ্গে ছিলেন শুধু তাঁর মা। খুনটা যদি মায়ের অনুপস্থিতিতে হওয়া সম্ভব না হয়, তবে সেটা হয়ে থাকবে তাঁর উপস্থিতিতেই। সে ক্ষেত্রে হেতালের মা নিজেই এই কাজে জড়িত — এই সম্ভাবনা বিবেচনার মধ্যে না এনে উপায় নেই। ভদ্রমহিলার বয়স তখন ৫২, শারীরিক ভাবে যথেষ্ট শক্তসমর্থ ছিলেন বলেই প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন। ধনঞ্জয়ই বরং ছিলেন রোগাপাতলা। হেতালের মায়ের স্বল্পকালীন অনুপস্থিতিতে ধর্ষণ, খুন, ঘড়ি চুরি করা, কারও ডাকে ব্যালকনি থেকে সাড়া দেওয়া, জামাকাপড় পাল্টানো — এতগুলি কাজের জন্য ধনঞ্জয়ের হাতে সময় বড্ড কম ছিল। হেতালের মায়ের সময়ের অভাব ছিল না।

হেতালের খুনে যদি তাঁর নিজের মা জড়িত থাকেন, ধর্ষণ তবে করল কে? সোজা উত্তর হল, ধর্ষণ সম্ভবত আদৌ হয়নি। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে সদ্য ছেঁড়া সতীচ্ছদ ও চাপ ধরা যৌনকেশের উল্লেখ আছে, কিন্তু যৌনাঙ্গে বা তার আশেপাশে কোনও আঘাতের উল্লেখ নেই। বাইশ দফা আঘাতের উল্লেখ আছে রিপোর্টে, তার প্রায় সবটাই মুখে ও ঘাড়ে (ছবি দেখুন)। ময়না-তদন্তের রিপোর্টে হেতালের আত্মরক্ষার চেষ্টার উল্লেখ থাকলেও যৌনসঙ্গমে বাধা দেওয়ার নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই রিপোর্ট দেখে কোনও অভিজ্ঞ ডাক্তার বলবেন না যে ধর্ষণই হয়েছিল। এমন হতেই পারে যে সঙ্গমের ঘটনাটি

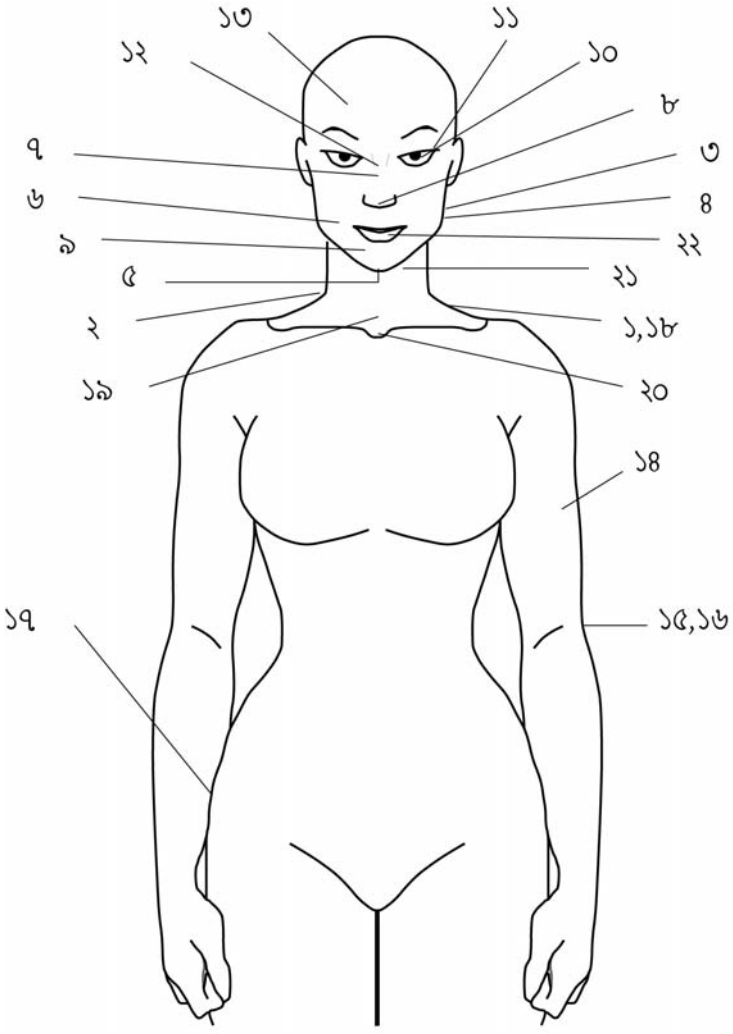

হেতালের শরীরের বাইশ দফা আঘাত

ছিল ঐচ্ছিক এবং তা ঘটেছিল খুনের অনেকটা আগে। স্বাভাবিক ভাবেই ময়না-তদন্তের রিপোর্টে 'ধর্ষণ' শব্দের উল্লেখমাত্র নেই। 'ধর্ষণ হয়েছিল কি না' পুলিশের এই নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলা হয়েছিল, মৃত্যুর আগে যৌনসঙ্গম হয়েছিল। পরে আদালতে এই কথাটিকেই ধর্ষণ বলে চালানো হয় এক ভাসা ভাসা যুক্তিতে, যার মূল কথা হল — ময়না-তদন্তের আগে থেকেই পুলিশ ধর্ষণ সন্দেহ করেছিল। ফরেনসিক পরীক্ষায় ভ্যাজাইনাল সোয়াবে বীর্য পাওয়া না গেলেও যৌনকেশ ও প্যান্টিতে পাওয়া গিয়েছিল। এমনটা হওয়া সম্ভব ঐচ্ছিক সঙ্গমের পর প্যান্টি আবার পরা হলে। হেতাল বাড়ি ফেরার পর সঙ্গমের কথা কোনও ভাবে প্রকাশ হয়ে থাকলে মায়ের সঙ্গে তাঁর সংঘাতের একটা সম্ভাব্য পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যায়। প্যান্টির সেই বীর্য-নমুনার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের বীর্য-নমুনা কিন্তু মেলানোও হয়নি। কোনও ডিএনএ টেস্ট হয়নি।

প্রায় ১০০ গ্রামের মতো 'হজম না হওয়া' এবং 'গন্ধহীন' খাবার হেতালের পাকস্থলিতে পাওয়া গিয়েছিল। একেবারে হজম না হওয়া কিছুটা খাবার পেটে থাকতে পারে যদি খুন হয়ে থাকে খাওয়ার অল্প পরেই। আইসিএসই পরীক্ষা দিয়ে হেতালের বাড়ি ফেরার কথা ছিল দুপুর একটা নাগাদ। সম্ভবত তিনি ফিরেছিলেন ঘণ্টাখানেক দেরিতে, কারণ লিফটম্যান বেলা দু'টো পর্যন্ত তাঁকে ফিরতে দেখেননি। সাধারণ পরিস্থিতিতে বাড়ি ফেরার অল্পক্ষণের মধ্যে হেতালের দুপুরের খাওয়া হয়ে যাওয়ার কথা। অর্থাৎ হেতালের মা বিকেলে যেটুকু সময় বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন বলে সরকারি কাহিনীতে দাবি করা হয়েছে, তার অনেকটা আগেই খুন হয়ে থাকতে পারে। অথচ হেতালের ময়না-তদন্তে খুনের সময় নিরূপণে এই খাবারের তথ্য ব্যবহার করা হয়নি, যেমনটা হয়েছিল আরুষি তলোয়ারের খুনের ক্ষেত্রে।

হেতালের মৃতদেহ আবিষ্কারের সময় তাঁর মায়ের আচরণ ছিল অদ্ভুত। মন্দিরে যাওয়ার সময় তিনি স্প্রিংল্যাচ-যুক্ত সদর দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করেছিলেন, চাবির গোছা সঙ্গে নেননি। ফিরে এসে তিনি বার কয়েক কলিং বেল টিপে ডাকাডাকি করার পরেই উপস্থিত পরিচারকদের তড়িঘড়ি দরজা ভাঙার নির্দেশ দেন। মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, বা বাথরুমে গেছেন, বা

অল্পক্ষণের জন্য বাড়ির বাইরে গেছেন কি না বোঝার চেষ্টাই করেননি; তাঁকে ইন্টারকম বা টেলিফোনে ধরার চেষ্টাও করেননি।

দরজা ভেঙে হেতালের মৃতদেহ আবিষ্কার হওয়ার পর কেউ এক জন বলে থাকতে পারে, ধনঞ্জয়কে এই তল্লাটে একটু আগে দেখা গিয়েছিল। তখন হেতালের মা নাকি ধনঞ্জয়ের নাম ধরে চিৎকার শুরু করেন। (ধনঞ্জয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; ফিরে এসে এই সব খবর পেয়ে তিনি পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন।) তার পর হেতালের মা একা হাতে মৃতদেহ তুলে রওনা দেন হাসপাতালের উদ্দেশে, কিন্তু এক তলা পর্যন্ত পৌঁছে লিফটের মধ্যেই এক ঘণ্টা বসে থাকেন দেহ কোলে করে, ছেলে ফেরা পর্যন্ত। দুই ডাক্তার এসে সেই অবস্থাতেই দেহ পরীক্ষা করে হেতালকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং পুলিশে খবর দিতে বলেন। পুলিশে খবর দেওয়া হয় মৃতদেহ আবিষ্কারের প্রায় তিন ঘণ্টা বাদে।

পুলিশ এলে হেতালের বাবা দেখিয়ে দেন মৃতদেহ কোনখানে পাওয়া গিয়েছিল, পূর্বাপর বর্ণনা দেন এবং একটি বোতাম ও একটি গলার চেনের দিকে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, পরবর্তী কালে যা ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে প্রামাণ্য বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয়। লালবাজার থেকে ডিসি-ডিডি প্রসূন মুখোপাধ্যায় তাঁর দলবল নিয়ে ওই রাত্রেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতি দেন। পর দিন সব কাগজে মূল অভিযুক্ত হিসাবে ধনঞ্জয়ের নাম বেরোয় এবং বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ তাঁর খোঁজ শুরু করে। ফলে তাঁর পক্ষে প্রকাশ্যে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুলিশ তদন্ত করতে থাকে হেতালের পরিবার থেকে পাওয়া 'তথ্যের' ভিত্তিতে। হেতালের পরিবারের বক্তব্য পুলিশের অনেকটা বিশ্বাস হয়ে থাকতে পারে এই কারণে যে তাঁরা সম্ভবত আভাস দিয়েছিলেন, হেতাল ধনঞ্জয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন (যদিও এমন সম্পর্কের কোনও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি)। হেতালের মাকে পুলিশ বিশেষ ঘাঁটায়নি। ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে মুম্বই চলে যেতে দেওয়া হয়। ও দিকে 'হাই প্রোফাইল' এই মামলার কিনারা করার চাপ পুলিশের উপর ছিলই, আর সূত্র বলতে তাদের হাতে বাকি ছিল

সেই পালিয়ে যাওয়া সিকিউরিটি গার্ড ধনঞ্জয়। ঘটনার মাস দুই পরে তিনি গ্রেপ্তার হন। তার পর পুলিশ কেস সাজিয়ে ফেলতে দেরি করেনি।

হেতালের বাবার বয়স তখন ৬২। গয়না ও জুয়েলারির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা ছেড়ে, ভবানীপুরের নতুন কেনা তিন কামরার ফ্ল্যাটবাড়ি ছেড়ে, পরের বছর ছেলের বারো ক্লাসের পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও খুনের ছ'মাসের মধ্যে কলকাতার পাট চুকিয়ে তিনি সপরিবার মুম্বই চলে যান। অথচ মেয়ের খুনের মামলার শুনানি তখনও শুরু হয়নি। ধরা পড়ার ভয় ছাড়া এই আচরণের সহজ ব্যাখ্যা নেই।

'চুরি হওয়া' ঘড়ি 'উদ্ধার' হওয়ার পর হেতালের পরিবার আদালতে চিঠি লিখে সেই ঘড়ি ফেরত চায়। পুলিশ আপত্তি করে, কারণ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ তখনও শুরু হয়নি। ঘড়ির সিরিয়াল নম্বর মেলাতে গিয়ে সব জানাজানি হয়ে যেতে পারে, সেই ভয় ছাড়া পরিবারের এই অদ্ভুত আর্জির ব্যাখ্যা করতেও কল্পনার জোর লাগে।

মামলার শুরুতে হেতালের মা আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া এড়াতে থাকেন। বার বার এমন হওয়ার পর বিরক্ত হয়ে আদালত এক বার তাঁকে সেই দিনই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য করে। তার পর 'অসুস্থতার' কারণে শুনানির বিকল্প দিন ধার্য হয়। শেষে সাক্ষ্য দিতে উঠে তিনি যা বলেন, তার সঙ্গে পুলিশকে দেওয়া তাঁর জবানবন্দির প্রচুর গরমিল ছিল। মৃতদেহ কোথায় পাওয়া গেছে, কী অবস্থায় পাওয়া গেছে, কখন তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন — সব বিবরণই দু'জায়গায় দু'রকম। মন্দির থেকে ফিরে আসার সময়ের বিবরণ দু'জায়গায় আলাদা নয়, কিন্তু ফিরে আসা আর মৃতদেহ আবিষ্কারের সময়ের মধ্যে এক মিনিটেরও ব্যবধান নেই!

মামলার জন্য বানানো সাক্ষ্যপ্রমাণগুলির কথা ছেড়ে দিলে, খুনের তদন্তের শুরুতে পুলিশের কাছে ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে তথ্য বলতে ছিল শুধু ঘটনার আগে-পরে বাড়ির আশেপাশে তাঁর উপস্থিতি এবং খুন আবিষ্কার হওয়ার পরেই তাঁর পালিয়ে যাওয়া। এগুলি সন্দেহের কারণ হতে পারে, কিন্তু মৃতার পরিবারকে সন্দেহ করার কারণ তার চেয়ে কম ছিল না। অথচ সেই সম্ভাবনা নিয়ে পুলিশ মাথাই ঘামায়নি, আদালতের সামনেও তা কেউ পেশ করেনি। খুনের জায়গায় পৌঁছনোর দু'ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ ঘোষণা করে দেয়, তারা ধনঞ্জয়কেই সন্দেহ করছে।

হেতালকে ধর্ষণ করা হয়েছিল, সরকারপক্ষের এই দাবিকে ধনঞ্জয়ের উকিলের তরফে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি কোনও আদালতে। নিম্ন আদালতে ধনঞ্জয়ের উকিল কাগজপত্র দেরিতে বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি, সাক্ষীদেরও ঠিকমতো জেরা করেননি। ফলে বানানো নথি আর মিথ্যা সাক্ষ্য মান্যতা পেয়ে গেছে। বদলির নির্দেশ হাতে পাওয়ার কথা ধনঞ্জয় অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু উকিলবাবু পরোক্ষে সে কথা মেনে নিয়ে তাঁর বিপদ বাড়িয়ে দেন — হাইকোর্টের রায়ে এর উল্লেখ আছে। ধনঞ্জয়ের বাবা — বাঁকুড়ার অজ গাঁয়ের দরিদ্র পুরোহিত — তাঁর কাছে লেখা উকিলবাবুর চিঠি দেখে জানা যায় যে তিনি প্রত্যাশা মতো পারিশ্রমিক পাননি। বস্তুত মামলা কিছু দিন চলার পরেই তাঁর উৎসাহ কমে যাওয়া স্পষ্ট হয়। আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি যে ছক কষেছিলেন তার মাথামুণ্ডু ছিল না। কোনও প্রমাণ ছাড়াই 'আমি সেখানে ছিলাম না, সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম' গোছের অজুহাত দেওয়া ছিল ধনঞ্জয়ের নিজের পায়ে নিজের কুড়ুল মারা, কারণ তার আগে একাধিক সাক্ষী আদালতে বলে গেছেন যে ওই সময় তাঁরা ধনঞ্জয়কে আশেপাশে দেখেছেন। ধনঞ্জয়ের পালিয়ে বেড়ানোর অজুহাতও ছিল কাঁচা। উকিলবাবু তাঁর দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করলে এমন হত না। উপযুক্ত আইনি সহায়তা সস্তায় জোটে না। ফাঁসির কিছু দিন আগে ধনঞ্জয় উপলব্ধি করেছিলেন, গরিব বলেই তাঁর ফাঁসি হচ্ছে।

আদালতের কিছু সিদ্ধান্তও ছিল ধনঞ্জয়ের তরফের ভুলের মতোই আশ্চর্যের। হেতালের কাছ থেকে তাঁর মা যে 'অভিযোগ' শুনেছেন বলে দাবি করেছিলেন, তাকে মহামান্য হাইকোর্ট মৃতার 'মৃত্যুকালীন জবানবন্দি' হিসাবে গ্রহণ করে। লিফটম্যানের সাক্ষ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ (যা খুনের দিন সংবাদমাধ্যমকে পুলিশের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে মেলে) বাদ দেওয়া হয় এই অজুহাতে যে পুলিশের খাতায় লিখতে-পড়তে না-জানা এই লোকটির বয়ান হিসাবে অন্য কথা লেখা আছে। অথচ, অন্য চার জন সাক্ষীর ক্ষেত্রে এই ধরনের যাবতীয় গরমিল অগ্রাহ্য করা হয়। সরকারপক্ষের কাহিনীর ফাঁকফোকর ভরাট করতে খোদ হাইকোর্ট কিছু ব্যাখ্যা দেয়। যেমন, ধনঞ্জয়ের পোশাকে

রক্তের দাগ না থাকার কারণ ব্যাখ্যা করা হয় এই বলে যে, অপরাধ ঘটানোর আগে অভিযুক্ত নিশ্চয় বিবস্ত্র হয়েছিল। এমন অবিশ্বাস্য যুক্তি বিচারব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের আস্থাকে টলিয়ে দেয়। জামাকাপড় ছাড়তে ও পরতে যে বাড়তি সময় লাগে, এতগুলি অপরাধ ঘটানোর সময়ের সঙ্গে তার যোগফল হেতালের মায়ের অনুপস্থিতির অবকাশের চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া আক্রমণকারী বিবস্ত্র হওয়ার সময় হেতাল কী করছিলেন — এই প্রশ্নের সদুত্তরও নেই।

আদালতে কোনও তত্ত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব আসামির নয়, সরকারপক্ষের। কিন্তু উচ্চ আদালতে এই দায় বর্তেছিল ধনঞ্জয়ের উপরেই। ধনঞ্জয়ের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে যাবতীয় বেনিয়মকে আদালত অগ্রাহ্য করে এই যুক্তিতে যে "এই বেনিয়মের জন্য শুধু দরকার নজিরগুলিকে যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে নেওয়া।" অথচ 'বাজেয়াপ্ত' করা ঘড়ির সিরিয়াল নম্বর "যত্নের সঙ্গে" মিলিয়ে দেখা হয়নি। রায়ে বলা হয়, "এটা ঠিক যে তদন্তকারী অফিসারের ক্যাশ মেমো, বা অন্তত তার কার্বন কপি অবশ্যই বাজেয়াপ্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর কর্তব্যে এই খামতি দেখে সিদ্ধান্ত করা যাবে না যে গ্যারান্টি কার্ডটি পরে বানানো হয়েছিল।" দোষ-প্রমাণ-না-হওয়া-পর্যন্ত-নির্দোষ বলে এখানে ধরা হয়েছে আসামিকে নয়, অন্য কাউকে।

আদালত খেয়াল করে দেখেনি যে মৃতার পরিবার, সিকিউরিটি এজেন্সি, পুলিশ এবং সরকারপক্ষ — প্রত্যেকেরই ধনঞ্জয়কে দোষী প্রমাণ করার আলাদা আলাদা গরজ থাকতে পারে, বা এই প্রতিষ্ঠানগুলি মৃতার পরিবারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয়েও একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকতে পারে। সিকিউরিটি এজেন্সি খুন ঠেকাতে পারেনি, মূল অভিযুক্ত তাদের কর্মী। ধনঞ্জয়কে বলির পাঁঠা বানিয়ে পুলিশকে খুশি করলেই তাদের সুবিধা। পুলিশ ও সরকারি উকিলের পক্ষে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারাটা কৃতিত্বের। এই কেসে দোষীর দ্রুত শাস্তির জন্য বাইরের চাপ ছিল। মৃতার পরিবারকে একেবারেই সন্দেহ করা হয়নি; পালিয়ে বেড়ানো সিকিউরিটি গার্ডকে কব্জা করা ছিল সবচেয়ে সহজ রাস্তা। পুলিশ চাইলে ইচ্ছামতো সাক্ষ্য এবং প্রমাণ সাজাতেই পারে, সে ক্ষমতা তাদের বিলক্ষণ আছে। জিনিসপত্র

‘বাজেয়াপ্ত’ করার প্রতিটি ঘটনায় পুলিশের সাক্ষীরা হয় হেতালের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত, না হয় সরাসরি পুলিশের দ্বারা প্রভাবিত। মামলার মূল সাক্ষীরা সিকিউরিটি এজেন্সির কর্মচারী, ‘বিরূপ সাক্ষী’টি ছাড়া। নিম্ন আদালতে সরকারপক্ষের পেশ করা কাহিনী আদতে হেতালের পরিবারের বলা গল্প, ভুয়ো সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে যাকে জোরদার করা হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মহিলাদের উপর অপরাধের ‘ঊর্ধ্বগতি’র কথা তারা বিবেচনার মধ্যে এনেছে। সেই সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীদের ছাড়া পেয়ে যাওয়ার কথাও স্মরণ করেছেন বিচারপতিরা। ‘অপরাধীদের বিচারের জন্য সমাজের আকুল আবেদনে’ আদালতের সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনের কথা তুলে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট ধনঞ্জয়ের ফাঁসির আদেশ দেয়। এই সব কথা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক, অনেক প্রকৃত অপরাধীর ছাড়া পেয়ে যাওয়ার দায় নিতে হয়েছে একা ধনঞ্জয়কে। এই মামলায় আদালতের রায় প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে সংবাদমাধ্যমের থেকে, কারণ ‘সমাজের আকুল আবেদন’ আদালতের কাছে পৌঁছনোর কোনও সোজাসুজি রাস্তা নেই। দেখা যাচ্ছে, বাধ্যবাধকতা ছিল আদালতেরও।

হয়তো এই চাপের কারণেই ধনঞ্জয়কে প্রাণদণ্ড দিতে গিয়ে একটি জরুরি শর্ত মিলিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। যার শাস্তি হচ্ছে, সে কেমন অপরাধী (সে স্বভাবতই অপরাধী কি না, আগে কোনও মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে কি না, তার ‘শুধরানোর’ সম্ভাবনা আছে কি না, ইত্যাদি) সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়নি। ২০১৩–য় এসে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আর একটি বেঞ্চ এই ভুল ধরিয়ে দেয় (শঙ্কর কিসানরাও খাড়ে বনাম মহারাষ্ট্র মামলায় ২৫ এপ্রিল ২০১৩–র রায়)।

দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড

পুলিশ, সিকিউরিটি এজেন্সি, সরকারি উকিল ও আদালত বাধ্যবাধকতার মধ্যে সাধারণত যা করে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই করেছিল। ঘটনাক্রমে এদের সকলের লক্ষ্য একমুখী হয়ে এক বিরাট শক্তি তৈরি হয়। ধনঞ্জয়ের একমাত্র জোর ছিল

এই যে তিনি নির্দোষ; এত বড় শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানগুলি একই সমাজের অংশ, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আছে সংস্কার। সম্ভবত সকলেরই সহানুভূতি ছিল ‘পরিবার’ নামক প্রতিষ্ঠানটির প্রতি, যার ছত্রছায়াতেই কখনও কখনও মেয়েদের উপর প্রাণঘাতী হিংসা নেমে আসে। এই আচ্ছন্নতাই সম্ভবত সমস্ত তথ্যগুলিকে সামগ্রিক ভাবে দেখার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিকল্প কোনও তত্ত্বের অভাবে প্রতিটি অসঙ্গতি আলাদা আলাদা করে দেখে উপেক্ষা করা হয়েছিল। সকলে যেন জানত খুনটা ধনঞ্জয়ই করেছেন, তাই তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের যা–কিছু অসঙ্গতি নানা জনে নানা ভাবে সে সব লঘু করতে যেন কাঁধে কাঁধ লাগিয়েছিল। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক স্তরে চরম সাজার পক্ষে অতিসক্রিয়তাও ছিল অভূতপূর্ব।

আর ধনঞ্জয় ঠিকই জেনেছিলেন — যে–খুন তিনি করেননি, চোদ্দো বছর পরে সে জন্য তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে শুধু তিনি গরিব বলেই।

সেই ফাঁসির পর কেটে গেছে এক দশক। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, আলোচনা, ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সর্বোপরি মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা করেই তৈরি হয়েছে এই প্রতিবেদন। যা ইঙ্গিত করছে এক মারাত্মক বিচার–বিভ্রাটের। মৃত্যুদণ্ডের মতো অপরিবর্তনীয় সাজার অপরিণামদর্শিতাও সমান ভাবে প্রকট হচ্ছে।

পুনর্বিচার, মরণোত্তর বেকসুর ঘোষণার দাবিও তাই খুব স্বাভাবিক।

যোগাযোগের ঠিকানা

অধ্যাপক দেবাশিস সেনগুপ্ত
৬৬ অমৃতলাল দাঁ রোড
তৃতীয় তল
বরাহনগর, কলকাতা ৭০০০৩৫

অধ্যাপক প্রবাল চৌধুরী
৮ রামলাল আগরওয়ালা লেন
সিঁথি
কলকাতা ৭০০০৫০

ই-মেল : **shairiksengupta@gmail.com**

মামলার বিস্তারিত তথ্য : **www.india-hanged-innocent.org**